সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম ২

আবুসাইদ মাহফুজ

ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধটা এখন অনেকটা ওপেন সিক্রেট ব্যাপার। কেন এই যুদ্ধ? ওয়ার অন টেরোরিজমের নামে কে কার বিরুদ্ধে কি করতে চাইছে এর সাথে কার তেল নুন রুটি রুজি আর দামি গাড়ির তেল জড়িত তা বলতে গেলে সর্বজ্ঞাত। বাংলাদেশের সেই প্রসিদ্ধ গল্প ভালুক আর ভেড়ার পানি খাওয়া নিয়ে গল্প। ভালুক কিভাবে ভেড়ার ঘাড়ের রক্ত খাওয়ার জন্য কতরকমের অযৌক্তিক অযুহাত পেশ করেছে। আমরা সবাই গল্পটা জানি। বিশ্বের মানুষ ভালভাবেই জানে ব্যাপারটা যে আসলে ইরাকের তেলের খনিতে বিশ্বমোড়ল আমেরিকার লোলুপ দৃষ্টি।

অন্য আরেকটি কারণ রয়েছে তা হলো এই ইরাক একটি ঐতিহ্যবাহী দেশ। হাজার হাজার বছরের ইতিহাস এই ইরাকের। যেদিন কোন ইউরোপ ছিলনা, যেদিন কোন আমেরিকার জন্মও হয়নি সেদিনও ইরাক ছিল। যেদিন খৃষ্টবাদ, ইহুদীবাদ কিংবা ইসলাম নামের ধর্ম ছিলনা সেদিনও এই ইরাক ছিল এই ইরাকেই জন্ম নিয়েছিলেন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম। যে ইব্রাহীম (আঃ) কে সকল সেমেটিক ধর্ম ইহুদী, খৃষ্টান এবং ইসলাম ধর্ম তাদের পিতৃপুরুষ মনে করে সেই ইব্রাহীম আঃ এর জন্ম এই ইরাকে। ইরাক হলো সভ্যতার সুতিকাগার। সেই সুমেরিয়ান সভ্যতা, মেসোপটেমিয়ান সভ্যতা উৎস এই ইরাকে। ইরাকের টাইগ্রীস নদীর তীরেই সভ্যতার গোড়াপত্তন। ইরাকের উত্তর পশ্চিমে সিরিয়া, পশ্চিমে সৌদি আরব। ইরাকের ঠিক পূর্ব পাশেই বিশাল সীমান্ত জুড়ে রয়েছে ইরান। যে ইরানকে নিয়েও আমেরিকার ভয়। আমেরিকার দৃষ্টিতে টেরোরিস্ট দেশ। ইরানের উত্তর পুর্বে রয়েছে আমেরিকার সাবেক আতঙ্ক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রদেশ, বর্তমান মুসলিম দেশ তুর্কেমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, ইরানের পূর্বে রয়েছে আফগানিস্তান। ইরান এবং আফগানিস্তানের বিশাল সীমান্ত জুড়ে রয়েছে পাকিস্তান।

সুতরাং পুরো মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে রয়েছে আমেরিকা এবং ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির এক বিরাট আতংক। এ জন্যই পশ্চিমের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষনা করা হয়। মিডল ইস্টার্ণ স্টাডি নামে প্রায় প্রতিটি বড় বড় বিশ্ববিদ ্যালয়ে ইসলাম এবং ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ নিয়ে গবেষনা চলে আসছে। শুধু তাই নয়, মধ্যপ্রাচ্যই পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালেই দেখা যায় মধ্যপ্রাচ্যই হলো পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে অবস্থিত।

এই ইরাকে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার জন্ম, এই ইরাকে হযরত আবদুল কাদের জীলানীর জন্ম, ইমাম আবু হানিফার জন্ম। সাদ্দামও না, বিন লাদেন ও না, তালেবান ও না। এসব হলো ভালুকের অজুহাত মাত্র। কোথায়এগারই সেপ্টেম্বর, কোথায় বিন লাদেন, কোথায় তালেবান, কারজাই, তারপর সাদ্দাম, জাতিসংঘ প্রতিনিধি দল প্রেরণ, সারা বিশ্বের সকল মানুষের যুদ্ধ বিরোধী মিছিল, প্রতিবাদ। না, সকল কিছুর উপরে কথা একটাই। তালেবানকে সরালাম, সাদ্দামকে সরাতেই হবে, কারণ একটাই, মধ্যপ্রাচ্যের তেলের খনি যে আমাদের নিয়ন্ত্রনে চাইই। তারচে' বড় কথা হলো মধ্যপ্রাচ্যে গেড়ে বসে মুসলমানদেরকে শায়েস্তা করা।মধ্যপ্রাচ্য বা ইরাক, ইরান, সিরিয়া, সৌদি আরব, ওমান, কাতার, মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এই বিশাল এলাকা যেহেতু মুসলিম প্রধান দেশ সুতরাং সেখানে সিন্দাবাদেরদৈত্যের মত গেড়ে বসে মুসলমানদের ঘাড় মচকাতে হবে।পাঠক যদি একটু মানচিত্রের দিকে তাকান তাহলে লক্ষ্য করবেন যে, এই ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কেমিনাস্তান, কাজাকাস্তান, উজবেকিস্তান, পাকিস্তান সবগুলোই স্তানই কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। শুধু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠই নয়, মধ্য এশিয়ার এই স্তান এরিয়াতেই ইমাম বোখারীসহ অনেক মুসলিম মনীষির জন্ম। মুসলিম বিশ্বের জন্য এই স্তান এরিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু স্তান এরিয়াই নয়। পাকিস্তান থেকে নিয়ে পুরো মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলো ভেদ করে উত্তর আফ্রিকার মিশর, তিউনিসিয়া, মরক্কো নিয়ে আটলান্টিক পর্যন্ত এই বিশাল এরিয়া মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। যদি কোনদিন মুসলমানদের সুমতি আসে, যদি কোনদিন মুসলমানরা শিখতে পারে যে কিভাবে মতদ্বৈততা নিয়ে ও কিভাবে অপরের সাথে কাজ করা যায় সেদিন হয়তো এই বিশাল এলাকা জুড়ে একটি মুসলিম যুক্তরাস্ট্র গঠিত হতে পারে। সেই মুসলিম যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠবে বর্তমান মহাশক্তিধর যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের যে, অনেক বেশী শক্তিশালি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তেল নয় অর্থনীতির অনেক দিক বিচারে এ এরিয়াই হয়ে উঠবে বিশ্বের প্রধান শক্তি। সেজন্যই স্বভাবতই অনেকেই চায়না যে, এই আরব বিশ্ব আর স্তান এরিয়া এক হোক।

অংকটা আসলে একেবারে সোজা। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হলো এই অংকে আমরা খুবই কাঁচা। যোগ বিয়োগটা আমরা মেলাতে পারিনা, আমরা বুঝিনা কেন এমন হচ্ছে, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়াচ্ছে, কোথাকার কলকাঠি কারা নাড়ছে। সমীকরণটা বুঝার জন্য নিন্মে একটি ডায়াগ্রাম দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন হলো এই পরিচয়কে মুসলমানরা কিভাবে গ্রহন করবে বা জবাব দেবে। তালেবান, বিন লাদেন, মৌলবাদ, টেরোরিজম, আল কায়েদা, হামাস, হিজবাল্লাহ এ সবগুলোর সাথে

মুসলমানরাই জড়িত। ইরান, সুদান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, চেচনিয়া, ফিলিস্তিন, বাংলাদেশ, আলজেরীয়া সবগুলোই্ মুসলিম দেশ।

অন্য অর্থে কথাটাকে আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হবে যে, সারা বিশ্বে যে কোন কারণেই হোক না কেন। সত্য হোক কিংবা মিথ্যা হোক মুসলমানরাই কোননা কোনভাবে সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত। তাই আজকের এই পর্যালোচনায় এ বিষয়েই আলোকপাত করা হবে যে, মুসলমানরা আসলেই কি সন্ত্রাসী কিংবা যদি সন্ত্রাসী না হয়ে থাকে তবে কেন মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী বলা হয়ে থাকে।

হ্যাঁ এ কঠিন প্রশ্নের উত্তরে আমি সম্মানিত পাঠকদের গভীর মনযোগ আকর্ষণ করবো। এ ব্যাপারে দুটো দিক আমাদের চোখের সামনে রাখতে হবে

(১) সংস্কৃতিক এবং ভৌগলিক কারণে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর মানুষের মধ্যে আসলেই কিছু সমস্যা রয়েছে। যেমন অন্য কিছু সমস্যা রয়েছে পৃথিবীর অন্যন্য জাতি এবং গোষ্ঠির মধ্যে।

(২) সমস্যাটা যেভাবে প্রচার করা হচ্ছে বা তুলে ধরা হচ্ছে সমস্যাটা মোটেই সেভাবে নয়।বর্তমান সভ্যতার বৃহত্তম শক্তি মুসলমানদের বিরদ্ধে অবস্থান করার কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচারণা হচ্ছে বেশী।

এবার আসুন একটু বিস্তারিত আলোচনায় আসা যাক (১) সমস্যার প্রথম যে বিষয়টা তুলে ধরা হয়েছে যে, সংস্কৃতিক এবং ভৌগলিক কারণে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমুহের মানুষের মধ্যে আসলেই কিছু মৌলিক সমস্যা রয়েছে। যে সমস্যাগুলোবৈষয়িক, সংস্কৃতিক এবংভৌগলিক।

আমরা জানি, ইসলামের উৎস অনেকটা আরব দেশসমুহে কেন্দ্রীভূত। আরো ভেতরে গেলে বলতে হবে সৌদি আরব ভিত্তিক।যদিও ইসলামের দৃষ্টিতে এটা ঠিক নয়। হাদীস শরীফে নবী করিম (সাঃ) বলেছেন, "আমি যাবার মুহুর্তে তোমাদের কাছে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি তোমরা যদি তা অনুসরণ করতে পারো তবে কোনদিন পথভ্রষ্ট হবে না। সে দুটো জিনিস হলো কোরআন এবং হাদীস।" সুতরাং কোরআন এবং হাদীসই হলো অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয়। আরব দেশ বা আরব সংস্কৃতি নয়।

যারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুটা হলেও লেখাপড়া করেছেন তাঁরা "আইয়ামে জাহেলিয়া" শব্দের সাথে পরিচিত। আইয়ামে জাহেলিয়া হলো মূলতঃ ইসলামপূর্ব আরবের অবস্থা। যাকে ইসলামের ইতিহাসে অজ্ঞতার যুগ বলা হয়ে থাকে। ইতিহাস অনুযায়ী সে সময় আরবের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তারা আপন কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দিত। সবসময় মারামারি কাটাকাটি করে সময় কাটাত। সামান্য উটের পানি খাওয়া নিয়ে মাসের পর মাস বছরের পর যুদ্ধ করতো। কথাটাকে আরো স্পষ্টভাবে বলা গেলে বলতে হবে যে, শুধু আইয়ামে জাহেলিয়া যুগে নয় বরং ঐতিহাসক সত্য হলো এই আরবরা যুগ যুগ ধরে সব সময়ই একটা গোঁয়ার জাতি হিসেবে পরিচিত। যোদ্ধা জাতি।পাঠকদের যিনিই কোন আরব দেশে বা বিশেষত সৌদি আরব কিছুকাল সময় দিনাপিত করেছেন কিংবা অন্য কোন দেশে অবস্থান কালে আরবদের সাথে লেন দেন বা উঠা বসা করেছেন বিষয়টা তাঁরা বিষয়টা খুব ভালভাবে উপলব্ধি করবেন। আমরা অনেক আরব কাহিনী জানি তাদের মেহমানদারীর কথা জানি। তারা মেহমানের জন্য নিজের সবকিছু বিলিয়ে দেবে। আবার কারো সাথে ঝগড়া ফাসাদ কিংবা মারামারি লাগলে নিজের সবকিছু ধ্বংস করে দেবে।

আরবদের হৃদয়টা অনেক বড় কিন্তু মাথার অনেকংশটা খালি।আরবদের সম্পর্কে খুব ভালভাবে জানেন এমন একজন জ্ঞানীজনের একটা সুন্দর উদাহরন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মনে করছি। উদাহরনটা হলো, আপনি যদি কখনো কোন বিপদে পড়ে কোন আরবের কাছে যান এবং নিজের সমস্যার কথা জানান, ঐ আরব সাথে সাথে তার পকেটে বা মনে করুন ব্যাংক একাউন্টে যা আছে সব দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবে, সে কখনো চিন্তা করবেনা যে পরক্ষণে সে নিজে কি খাবে। আবার অপরদিকে আপনি যদি কোনভাবে ঐ একই আরবকে মেজাজ খারাপ করেন তাহলে সে সাথে সাথে আপনাকে এক ঘা বসিয়ে দেবে। পরক্ষণে কি পরিণতি হবে এ আরব কখনো চিন্তা করবে না। আরবদের হৃদয়টা অত্যন্ত প্রশস্থ কিন্তু মাথাটা খুবই মোটা। আরবদের হৃদয়ের মত এত দরাজ দিল পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কোন জাতি পাওয়া ভার তেমনিভাবে আরবের মত মোটা মাথার জাতিও পাওয়া কঠিন। আরবরা জান দিতে জানে কিন্তু অনেক সময়ই জানেনা কিসের জন্য জানটা দিচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাসে আরবদের ইন্টেলেকচুয়াল ইতিহাস খুবই বিরল। বিশেষত সৌদি আরবের, বিশ্বের কোন প্রভাবশালি চিন্তাবিদ বা গবেষক এই সৌদি আরব থেকে উঠে আসেনি। বিশ্বের নামকরা ইসলামী চিন্তাবিদদের অধিকাংশই নন আরব।যা ক'জন আছেন তাদের বেশীর ভাগই হয়তো ইরাকী কিংবা মিশরী। বাকি অনেকেই নন আরব। এই একটি অনগ্রসর সমাজেই আল্লাহ পাক নবী করিম হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে পাঠিয়েছেন।

যারা আরব দেশে চাকুরী বাকুরী করেছেন তাদের অনেকেই এজন্য বলে থাকেন যে এ গোঁয়ার জাতিকে সোজা করার জন্যই আল্লাহ পাক এতগুলো নবী পাঠিয়েছেন। হ্যাঁ সত্যি সত্যি, এই মধ্যপ্রাচ্যেই সবগুলো ধর্মের মারামারি লড়াই সংগ্রাম।ইরাক, ফিলিস্তিন, মিশর। ইব্রাহীম (আঃ) এর জন্ম এই ইরাকে। তাঁর ইতিহাসের অনেকাংশ জুড়ে রয়েছে, মিশরসহ মধ্যপ্রাচ্য। এই ইব্রাহীম আঃ কে ইহুদীবাদ, খৃষ্টবাদ এবং ইসলাম এই তিনটি মৌলিক সেমেটিক ধর্মের সবাই শ্রদ্ধা করে। মোজেজ বা ইহুদীদের মুসা নবীর ইতিহাসও এই মিশরসহ মধ্যপ্রাচ্যকে কেন্দ্র করে। খৃষ্টবাদের জেসাস বা ঈসা নবীর সবকিছুই কিন্তু এই মধ্যপ্রাচ্যকে কেন্দ্র করে।অবশ্য আরবদের আরো একটা

গুনের কথা বলতে হবে তা হলো আরবদের আধ্যাতিকতা। একারণেই পৃথিবীর তিনটি প্রধান সেমেটিক ধর্ম ইহুদীবা, খৃষ্টবাদ এবং ইসলাম মুলতঃ এই আরব এলাকাকে কেন্দ্র করে। এ আরবরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যাবসার জন্য গিয়ে তাদের আধ্যাতিকার শক্তি দিয়ে, দরাজ দিলের উদারতা দিয়ে সমগ্র বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করেছিলেন।

মজার ব্যাপার হলো মৌলিক তিনটি ধর্ম বা যে তিনটি প্রধান ধর্ম নিয়ে বিশ্বের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির দ্বন্ধ চলছে তন্মধ্যে ইহুদীবাদ এবং খৃষ্টবাদে আরব প্রভাবের চে' ককেশীয় প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু ইসলামে আরব প্রভাবটাই প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এ কারণেই আরবদের ভৌগলিক সমস্যাটার সাথে ইসলাম জড়িয়ে গেছে।

সুপ্রিয় পাঠক, বর্তমান প্যারাগ্রাফে যে বিষয়টা স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে তা হলো আরব দেশগুলোর সংস্কৃতিক সমস্যা ইসলামের সাথে কিছুটা জড়িয়ে গেছে। এবং সেটাকে অনেকে ইসলামের সমস্যা হিসেবে মনে করে নিয়েছেন। তাই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রত্যেকের কাছে একথা অবশ্যই স্পষ্ট থাকতে হবে যে ইসলাম এবং ইসলামী সংস্কৃতি আর আরব সংস্কৃতি এক নয়। ইসলামী শরীয়া, আইন, নিয়ম নীতি সংস্কৃতির উৎস ৪ টি (১)কোরআন (২) হাদিস বা সুন্নাহ (৩)ইজমা (৪) কিয়াস বা ইজতিহাদ

কোন প্রকার আরব সংস্কৃতি ইসলামী তাহজীব তামাদ্দুনের উৎস নয়। সে প্রেক্ষিতেই লম্বা জোব্বার সাথে ইসলামী সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক নাই। অত্যন্ত বেদনার সাথে বলতে হচ্ছে এ বিষয়টাই পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মুসলমান বুঝতে ভুল করছেন। আমি নিশ্চিত জানি যে, আমার এ মন্তব্যে অনেক মুসলমান ব্যাথিত হবেন বা রেগে উঠবেন। কিন্তু সকল পরিণতি চিন্তা করেও আমাকে বলতে হবে যে, "যতদিন না মুসলমানরা এ পার্থক্য বুঝবে ততদিন বর্তমান পৃথিবীর সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়।"

মুসলমানরা যদি আরব স্বভাব সংস্কৃতিকে ইসলাম মনে করেন তখন তারা অন্য অর্থে আরবদের গোঁয়ার ব্যাবহারকেই ইসলামী ব্যাবহার হিসেবে গ্রহন করছেন। এ কথা দ্বারা একথা বুঝার অবকাশ নেই যে, ইসলামী তাহজীব ও তমদ্দুন বা সাথে সলফে সালেহীন বা পুর্বসূরীদের অবদানকে অস্বীকার করা হয়েছে। পাঠকের কাছে এ প্রসংগে এটাও স্পষ্ট থাকা দরকার যে, পূর্বসূরীদের অবদান বা মহৎ কাজগুলোকে অস্বীকার কিংবা অবজ্ঞা করে কোন সভ্যতাই টিকতে পারে না। এবং একথাও মানতে হবে যে, যেহেতু মহানবী মুহম্মদ (সাঃ) এর জন্ম হয়েছিল আরব দেশে এবং সাহাবা বা তাবেয়ীদের অনেকেই আরব ছিলেন সুতরাং আরব সংস্কৃতি স্বভাবতই ইসলামকে কিছুটা প্রভাবিত করবেই। এবং সে দৃষ্টিভংগিতেই আরবের পোষাক আষাক তথা লম্বা জুব্বা ইসলামী সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে এবং তাতে দোষের কিছু তো নেই বরং ভালই। তাছাড়া আরবদের অনেক ভাল গুন ও ইসলামী সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। আরবদের উদার দিল, অকপটতা, সাহস সত্যবাদিতা সমগ্র পৃথিবীকে হার মানাবে।

কিন্তু সাথে সাথে প্রতিটি মুসলমানের কাছে এটা স্পষ্ট থাকা জরুরী যে, কোনটা আরব সংস্কৃতি আর কোনটা ইসলামী শরীয়া। আগেই যেমন বলা হয়েছে ইসলামী শরীয়ার উৎস চারটি, কোরআন, সুন্নাহ বা হাদিস, ইজমা এবং কিয়াস। এ ক্ষেত্রে আরো একটা বিষয় জানা দরকার যে, ইজমা এবং কিয়াসের ভিত্তি কিন্ত কোরআন এবং হাদীস, অন্য অর্থে একমাত্র কোরআন এবং হাদীসই ইসলামী শরীয়ার একমাত্র উৎস। সুতরাং যে কোন কিছুই শরীয়ার অংশ হবার জন্য শর্ত হলো ইসলামী শরীয়ার উৎস থেকে উৎসরণ, অন্য অর্থে কোরআন হাদীস অনুযায়ী।

দুঃখজনক সত্য হলো, এ সমস্যাটা আসলে একটু গভীরে, বিষয়টা এমনকি অনেকের বিশ্বাসের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকগুলো আরব সংস্কৃতি এবং আচার আচরণকে অনেকে ইসলামের অংশ হিসেবেই যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস করে আসছেন। মুসলিম উম্মাহর সমস্যা সমাধানের জন্য এ বিষয়টা অবশ্যই নজরে রাখতে হবে।

আরব সংস্কৃতির অনুসরণের ক্ষেত্রে শুধু জামা কাপড় বা জুব্বা নয়। আরো কিছু বিষয় রয়েছে যে গুলো ইসলামী সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রগতির পথে অন্তরায়। সনাতন বিশ্বাস বা দৃষ্টিভংগি অনুযায়ী আমরা সব সময় কিছু কিছু পরিভাষা বা বিষয়কে ইসলাম বা ইসলামী তাহজীব ও তামাদ্দুনের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করে আসছি। যে পরিভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে, আধুনিকতা, প্রগতি, সংস্কৃতি, বিবর্তনবাদ, বাস্তববাদ ইত্যাদি। এই শব্দগুলো আমাদের কর্নগোচর হলেই এক শ্রেণীর মানুষ এ শব্দগুলোকে তাদের জন্য হারাম মনে করে, আবার অন্য শ্রেণী ঐ শব্দগুলোকে তাদের নিজস্ব সম্পত্তি মনে করে। প্রকৃতপক্ষে এই শব্দগুলোর সাথে ইসলাম বা ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতার কোন দ্বন্ধ তো নেইই বরং অনেক ক্ষেত্রেই বলা যেতে পারে এগুলো হলো ইসলামী শিক্ষার অংশ।

সমস্যাগুলো শুধু আরব সংস্কৃতির সাথেই সীমাবদ্ধ নয় কিছু কিছু সমস্যা আবার ভারত উপমহাদেশীয় সংস্কৃতির সাথে জড়িত। যেমন এর অন্যতম একটি সমস্যা হলো আধুনিকতা, প্রগতি, সংস্কৃতি, বিবর্তনবাদের সাথে। এটা একটা প্রচলিত ধারনা যে, ধর্ম মানেই এটা আধুনিকতার পরিপন্থি, প্রগতির অন্তরায়। এ ধারনাটা সম্পূর্ণরুপে ভুল। বিশেষতঃ ইসলামের ক্ষেত্রে এ ধারণা মোটেই প্রযোজ্য নয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামী শরীয়ার তৃতীয় এবং চতুর্থ দফা হলো মূলতঃ আধুনিকতা এবং প্রগতির পরিপূরক। ইজমা এবং ক্বিয়াস। ইজমা হলো মুলতঃ রাসুলের যুগে গৃহিত সাহাবাদের ঐক্যমত সিদ্ধান্তসমূহ আর ক্বিয়াস বা ইজতিহাদ হলো ইসলামী শরীয়া বা আইন কানুনের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা।

এক্ষেত্রে একটা প্রধান সমস্যা হলো কিছু কিছু গোঁড়াপন্থী আলেম সমাজ মনে করেন যে, ইজতিহাদের দ্বার এখন রুদ্ধ। তাঁরা মনে করেন চার ইমামের চার মজহাবের পর শরীয়তের মাসলা মাসায়েল নিয়ে আর ঘাঁটাঘাটির অবকাশ নেই। চার মজহাবের চার ইমাম যে, সমস্ত সমাধান দিয়ে গেছেন সেখানেই শেষ। মুলত এ ধারনার কারণেই সমস্যা একটু বেশী প্রকট আকার ধারণ করেছে। অথচ এমন ধরনের বিশ্বাস বা মতবাদ কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। কোরআন হাদীসের কোথায়ও এমন মতের সমর্থন পাওয়া যায় না। বরং কোরআন এবং হাদীসে স্পষ্টভাবে বার বার মুক্তচিন্তার ব্যাপারে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে অজস্রবার মুমিনদের চিন্তায় আঘাত হানা হয়েছে এই বলে যে, "তোমরা কি বুঝনা? তোমরা কি দেখনা? তোমাদের কি আক্কল নেই।"

সুরা আলে ইমরানে ১৯০-১৯১ নং আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে, "নিঃসন্দেহে এই বিশ্ব ভুমন্ডলের সৃষ্টিতত্বে, এবং রাত দিন বা সূর্য চন্দ্রের পরিবর্তন রহস্যে বুদ্ধিজীবিদের জন্য একটা নিদর্শন রয়েছে। (যে সমস্ত বুদ্ধিজীবিরা তাদের বসা বা দাড়ানো সর্বাবস্থায় আল্লাহ এবং আল্লাহর সৃষ্টিতত্বের কথা স্মরণ করে, এবং তারা সবসময় বিশ্ব ভুমন্ডলের সৃষ্টিতত্ব সম্পর্কে চিন্তা গবেষনা করে আর (সৃষ্টিরহস্য জেনে বিমোহিত হয়ে ভাবে) ও আমার প্রভূ, তুমিতো এত কিছু অযথাই সৃষ্টি করনি..." (আল কোরআন ৩:১৯০-১৯১)

সুরা বাক্বারার ১৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে,বিশ্বভুমন্ডলের সৃষ্টি, রাত দিন বা সূর্য চন্দ্রের পরিবর্তন পরিবর্ধন, সাগরে যে (কিভাবে জাহাজ ভাসে), আকাশ থেকে যে কিভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, যে বৃষ্টির পানিতে সবকিছু সুজলা সুফলা হয়ে উঠে। যে পানিতে মানুস জীবন ফিরে পায় (বৃষ্টির পানির রহস্য), বাতাস কিভাবে প্রভাহিত হয়? মেঘ কিভাবে আকাশে ভাসে, এসব কিছুর মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিজীবিদের জন্য কিছু নিদর্শন। (আল কোরআন ২:১৬৪)

সুরা গাশিয়ার ১৭-২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "এরা কি উটের দিকে তাকায়না যে এই উটকে কি রহস্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশকে কিভাবে সুউচ্চে স্থাপন করা হয়েছে? পাহাড়কে কিভাবে গেঁথে দেয়া হয়েছে? আর যমীনকে কিভাবে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে?" (আল কোরআন ৮৮:১৭-২০)

পবিত্র কোরআনে আরো বলা হয়েছে, একজন জ্ঞানী এবং একজন মুর্খ কখনো সমান হতে পারে না। শুধু তাই নয় পবিত্র কোরআন জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধিবৃত্তিকে এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছে যে, কোথাও কোথাও পবিত্র কোরআন চিন্তাশীর হবার জন্য কঠিন ভাষা ব্যাবহার করেছে। পবিত্র কোরআনে অনেক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে, " এদের কি, চোখ নাই. এদের কি বিবেক বুদ্ধি নাই, এরা কি চিন্তা করে না??"

শুধু উপরোক্ত আয়াতগুলোই নয় কোরআনে এভাবে অজস্র আয়াত রয়েছে যেসব আয়াতে চিন্তাশীলদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, হাদীস শরীফেও বুদ্ধিবৃত্তিকে পরম এবং চরমভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসুল সাঃ যখন মুয়াজ ইবনে জাবালকে ইয়েমেনের গর্বনর করে পাঠান তখন মুয়াজকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুয়াজ, তোমাকে তো ইয়েমেনে একাকী পাঠাচ্ছি তুমি সেখানে একাকী কিভাবে কাজ করবে। সমস্যা সমাধান কিভাবে করবে? তখন মুয়াজ বিন জাবাল প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন আমি কোরআন দ্বারা সমস্যা সমাধান করবো, তখন নবী করীম সাঃ তাকে আবার প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তোমার সমস্যার কোন সমাধান তুমি যদি কোরআনে না পাও তখন কি করবে, প্রতি উত্তরে মুয়াজ বললেন কোরআনে না পেলে আমি হাদীস থেকে সমাধান খুঁজবো। তখন রাসুল সাঃ তাকে আবার প্রশ্ন করলে, কিন্তু তুমি যদি সমস্যার সমাধান হাদীসে ও না পাও তখন কি করবে? তখন মুয়াজ বললেন, তখন আমি কোরআন এবং হাদীসের জ্ঞানের ভিত্তিতে আমার জ্ঞান এবং বিবেক দ্বারা সমস্যা সমাধান করবো। মুয়াজের উত্তর শুনে রাসুল সাঃ এত খুশী হয়েছিলেন যে তিনি আনন্দে মুয়াজ জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, হে মুয়াজ, আমি যোগ্য লোককেই ইয়েমেনের গভর্নর করে পাঠচ্ছি।

আজকের আলোচনার পর্বে আমরা এই উপসংহারে যেতে চাই যে, ইসলাম কখনো মুক্তচিন্তার পরিপন্থি নয়। ইসলাম আধুনিকতার বিপক্ষে নয়। তবে সকল ক্ষেত্রে পাঠককে একথা মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম যেহেতু নিজেই একটি আদর্শ, একটি বিশ্বাস, একটি দর্শন, একটি মতবাদ। সুতরাং ইসলামের মুক্তমনা, মুক্তচিন্তার দর্শন বল্গাহীন, লাগামহীন দর্শনের সাথে নাও মিলতে পারে। আজকে যারা মুক্তমনা, মুক্তচিন্তার একচ্ছত্র অধিপতি মনে করেন তাদের কাছে আমার প্রশ্ন তাদের এই দর্শনের মাপকাঠি কি? নীতিমালা কি? নিয়ম শৃংখলা, নীতিমালা ছাড়াতো কিছু চলতে পারে না।

লেখক আবুসাইদ মাহফুজ, সম্পাদক মাসিক বাংলা আমার
আগষ্ট ২১, ২০০৩, মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র